প্রথম আলো
তারিখ ২২ APR 2008
পৃষ্ঠা ৫

শিক্ষা

আবদুল মান্নান

বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্ভাবনা

সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২' রহিত করে একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, যেহেতু এখন সংসদ কার্যকর নেই সেহেতু নতুন আইনটি অধ্যাদেশ আকারেই জারি করা হবে এবং আগামী সংসদ কার্যকর হলে তা অনুমোদন করার জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। আগামী সংসদের ধরন ও প্রকৃতি কি হবে তা আগাম বলা এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। সেই সংসদ প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি কিভাবে গ্রহণ করবে তাও জানা সম্ভব নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি প্রণীত হয়েছিল ১৯৯২ সালে, বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনার সরকারের সময়, ১৯৯৮ সালে তা একবার সংশোধন করা হয়। বেগম জিয়ার প্রথম সরকার এবং বিগত জোট সরকারের আমলে সর্বমোট সাতচল্লিশটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনামলে অনুমোদন পেয়েছিল মোট নয়টি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে বেগম জিয়ার উভয় সরকার বেশ উদার ছিল এবং সেই উদারতার সুযোগ যারা নিয়েছেন তারা যে সবাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য ছিলেন তা হয়তো এখন আর বলা যাবে না। এটি এখন পরিষ্কার যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি, উপাচার্য নিয়োগ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বহুলাংশে রাজনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে বর্তমান বিরাজমান আইন তার [illegible]না কতটুকু দায়ী ছিল তা পরিষ্কার নয়। ২০০৮ [illegible]পর প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের খসড়ার গুরুতে [illegible] হয়েছে, আগে প্রণীত আইনগুলো পর্যাপ্ত না [illegible]য় নতুন অধ্যাদেশটি প্রণয়নের উদ্যোগ [illegible]য়া হয়েছে। আগের আইনটির অপর্যাপ্ততা কোন কোন জায়গায় ছিল তা পরিষ্কার করে উল্লেখ করলে সব পক্ষই উপকৃত হতো এবং প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এসব অপর্যাপ্ততা বা অংশটি পুনরাবৃত্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাও বোঝা যেত।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে নানা কারণে বিতর্কিত হয়েছে। এ বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান অত্যন্ত দ্রুত অবনতি হওয়া শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসব অধিভুক্ত কলেজ বিদ্যমান ছিল সেসব কলেজের নিয়ন্ত্রণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হল পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, সনদ বিতরণ, শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অনুমোদন। শুরুতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছয়শ' কলেজ অধিভুক্ত ছিল এবং এসব কলেজের কোনটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হতো না (চিকিৎসা বাদে)। বর্তমানে দেশের ১৫৯৭টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত, যার মধ্যে ১৩১৭টি কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয় এবং এসব কলেজে সাড়ে আট লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। বলা বাহুল্য, এসব কলেজের সিংহভাগেরই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই এবং এসব কলেজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা অনুমোদন পেয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ১৯৯৯ সালে আমার একবার সুযোগ হয়েছিল শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটির একটি সভায় অংশগ্রহণ করার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন রাজনৈতিক বিবেচনায় কলেজ অনুমোদন দেয়া, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যেন বন্ধ করা হয়, তা আমি সভায় উপস্থাপন করি। সভা চলাকালীন তা করতে গেলে প্রায় সব উপস্থিত সংসদ সদস্য থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে একেবারে অসম্ভব।

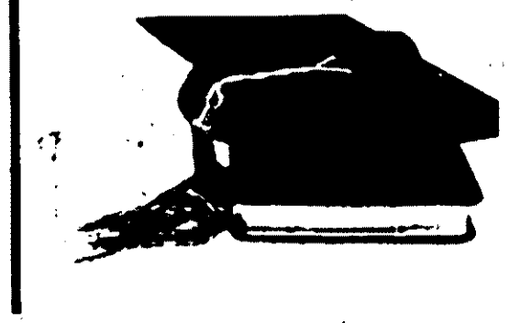

দেশে যেসব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেগুলোর শিক্ষার মানও যে খুব ভালো তা বলা যাবে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যারা বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা তারা করতে পারেন না পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও বাজেট বরাদ্দের কারণে। প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও দারুণভাবে অপর্যাপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের কমন রুম, হল, পাঠাগার অথবা রিডিংরুমে যেভাবে গাদাগাদি করে রাত যাপন করে তা একাত্তর সালের কলকাতার সল্ট লেকের শরণার্থী শিবিরের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সৃষ্টি হয়েছিল সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝখানে অবস্থান বজায় রেখে সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ আদায় করা। এদিক দিয়ে মঞ্জুরি কমিশনের সফলতা খুবই নগণ্য। অন্যদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের নানা অভিযোগ শোনা যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য সব নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে 'পাঁচশ' কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। সংবাদ মাধ্যমে এ অভিযোগও প্রকাশ পেয়েছে যে, এসব পদের বেশিরভাগই চড়া মূল্যে বিক্রি হয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য তার নিজের ছেলেকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য সব পর্ষদকে পাশ কাটিয়ে যোগ্যতার মাপকাঠি পরিবর্তন করে অত্যন্ত অনৈতিকভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেছেন। এ ধরনের অভিযোগ দেশের সবকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে প্রায়শই দেখা যায়। সরকার বা মঞ্জুরি কমিশন এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে হয় অনিচ্ছুক অথবা অপারগ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সার্বিক মান শুধু কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি সামগ্রিক বিষয়। সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কেই এর দায়িত্ব নিজের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে তুলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা যত না হওয়া উচিত নিয়ন্ত্রণমূলক, তার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত সহায়তামূলক। বিশ্বের অন্য যেসব দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান আছে, সেসব দেশে সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে সহায়তা করে থাকে। পাকিস্তানের অত্যন্ত উঁচুমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স (LUMS) প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সরকার দু'শ একর জমি নামমাত্র মূল্যে বরাদ্দ দিয়েছিল। তাকে করের আওতামুক্ত রেখেছিল। সম্প্রতি স্পেনভিত্তিক ওয়েবোমেট্রিস (Webometris) মান বিন্যাসে (Ranking) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উপমহাদেশে একাদশ। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সরকারি সহায়তা শূন্য এবং তাদের মোটা দাগে আয়কর দিতে হয় অন্য আর দশটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা না হয়ে হতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায়ক সংস্থা। বর্তমানে এ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্যতার দাবি রাখেন। তাদের নিয়োগেও কোন রাজনৈতিক বিবেচনা ছিল বলে মনে করার কারণ নেই। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, বিদ্যমান আইনের মাপকাঠিতেই অনেকগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাস্তি পাওয়ার মতো অপরাধ করেছে বা নিয়মিত করছে। ২০০৬ সালে বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করার অপরাধে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করা হয়েছিল। সম্প্রতি এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, এদের পাঁচটি তাদের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার অপতৎপরতা শুরু করেছে। এই অপতৎপরতায় মঞ্জুরি কমিশনের একশ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশ আছে এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনিয়ম দূর করাই মঞ্জুরি কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের যা সুযোগ-সুবিধা আছে তার তিন-চার গুণ বেশি শিক্ষার্থী তারা ভর্তি করায়। এদের কারও কারও বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও শোনা যায়, ভর্তি করার সময় শিক্ষার্থীদের তারা বলে দেয় নিয়মিত ক্লাসে না এলেও চলবে। শুধু বেতনটা নিয়মিত দেয়া চাই। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষার্থী সংখ্যা, আনুপাতিক হারে শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষের জায়গার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে তদারক করতে পারে। কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে একজন শিক্ষককে পাঁচটি বা ছয়টি ভিন্ন কোর্স বা সেকশন পড়াতে হয়। এটি একেবারেই অবাস্তব এবং অসম্ভব। এটি কোন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কিনা তা দেখার ব্যবস্থা মঞ্জুরি কমিশন করতে পারে। বিগত সরকারের আমলে নীলক্ষেত থেকে বই ভাড়ায় এনে গ্রন্থাগার সাজিয়ে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে, এমন অভিযোগও আছে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার দায়িত্ব একমাত্র মঞ্জুরি কমিশনই নিতে পারে। কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও উপাচার্য নিয়োগ দেননি চ্যান্সেলর। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য অথবা ট্রেজারার নিয়োগদানে সহায়তা মঞ্জুরি কমিশনই করতে পারে।

সম্ভবত ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তার বক্তৃতায় মূল সুর ছিল— 'পথের বাধা সরিয়ে নিন, সামনে পথ চলতে দিন।' বক্তৃতাটা মূলত সরকারের উদ্দেশে রচিত ছিল। তাতে বলা হয়েছিল, আধুনিক বিশ্বে সরকারের ভূমিকা হওয়া উচিত নিয়ামক (Catalyst) সূচক, প্রতিবন্ধকতা সূচক নয়। সেটি মেনে কাজ করলে দেশে অনেক নতুন নতুন খাত সব বাধা-বিপত্তি দূর করে সফল হতে পারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতও এমন একটি খাত মনে না করার কোন কারণ নেই। দেশে আজ যে প্রায় সোয়া লাখ ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী দেশের বাইরে চলে যেত এবং সবাই যে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো তা নয়।

নতুন অধ্যাদেশে এক্রিডেশন কাউন্সিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। তবে শুরুটা হওয়া উচিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এক্রিডেশনের মাধ্যমে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বর্তমানে খুব বেশি স্থিতিতে আছে তা বলা যাবে না। তাদের কাজ ছিল প্রধানত একটি জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, কোন নীতি-নির্ধারণী আইন প্রণয়ন করা নয়। প্রস্তাবিত আইনটি একটি নীতি-নির্ধারণী আইন। এরকম আরও নানা নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গ্রহণ করেছে। পরবর্তী সরকার এসব সিদ্ধান্তকে যদি বৈধতা না দেয় তাহলে দেশে বহুমাত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হবে যা জাতির জন্য মোটেও কাম্য নয়। এসব দিক বিবেচনা করেই মঞ্জুরি কমিশন সামনের দিকে অগ্রসর হবে বলে প্রত্যাশা করি। বাস্তবমুখী ও কার্যকর সহায়তা পেলে বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এটাও অনুধাবন করতে হবে, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হবে, সেগুলো নিজেদের সংশোধন না করলে এ খাত তার কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

আবদুল মান্নান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অব ভার্সিটি চ্যান্সেলরস-এর সাবেক চেয়ারম্যান